জলিমোহন কাউল : মুক্ত পৃথিবীর সন্ধানে

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

এক প্রাক্তন কমিউনিস্টের মার্কসবা থেকে গান্ধীবাদে উত্তরণ, কিংবা কমিউনিস্ট পার্টির এক প্রাক্তন নেতার আত্মকথা, যা প্রমাণ করে মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ,—জলি মোহন কাউল-এর স্মৃতিচারণ পাঠ করে এমন একটি ধারণাতেই অনেকে উপনীত হবেন, বামপন্থীর এই দুঃসময়ে অনেকেই প্রয়াসী হবেন এই বইটিকে বাম শিবিরের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে। লেখকের এই আত্মজৈবনিক বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠিত বাম বা বাম - বিরোধী কোনও মহলকেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুশি করতে পারবে না, যদি না অবশ্য কোনও সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বইটিকে বিচার করা হয়। এই ঝুঁকি নিয়েও তিনি কিন্তু প্রবৃত্ত হয়েছে এক অতি নির্মোহ ও গভীর আত্মানুসন্ধানে, যা নিছক এক আখ্যান নয়। তিনি লিপ্ত হয়েছে নিজেরই সঙ্গে এক আশ্চর্য কথোপকথনে, যা সূত্র ধরে উঠে এসেছে হারিয়ে যাওয়া এক সময়ের বহুমাত্রিক জটিলতা, কালস্রোতে প্রায় ভেসে যাওয়া একটি মানুষ ও তাঁর পরিবারের প্রথমে টিকে থাকা ও তার পরে উঠে দাঁড়ানো এক যন্ত্রণাদগ্ধ অভিজ্ঞতার স্মৃতি। কালের যাত্রায় লেখক বর্ণনা করেছেন তাঁর অতীতকে, কিন্তু তার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করেছেন বর্তমানের চোখ দিয়ে, যার ফলে পাঠকের কাছে লেখক ধরা দেন দুটি ভিন্ন চেহারায়। এক - এক সময়ে তিনি আখ্যানকার, আবার এক-একটি পর্বে তিনি নিজেই পাঠ করেন তাঁর আখ্যানে। দ্বিমাত্রিকতার এই মিশেল বইটিকে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা, যা অনেক সংবেদনশীল, রাজনীতি সচেতন পাঠককেই এক কঠিন অমীমাংসিত প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় : লেখকের এই আত্মানুসন্ধান কি নিছকই ব্যক্তিগত এক প্রয়াস, না এটি বামপন্থার, বামরাজনীতিরও আত্মজিজ্ঞাসা? দ্বিমাত্রিকতার যে আদলে বইটি বাঁধা এমন একটি সুত্রেরই আভাস তা থেকে মেলে।

দীর্ঘ ন'টি দশক জুড়ে ব্যাপ্ত জটিল কাউল - এর এই আখ্যানপর্ব, যা বর্ণিত হয়েছে ৩৮টি অধ্যায়ে। সঙ্গে রয়েছে অতি মূল্যবান কিছু ফটো। বলা যেতে পারে, এই কাহিনির শুরু ১৯২৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর যখন শিশু জলি পা রাখলেন কলকাতা শহরে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে। তার পরে ক্রমে বিস্তার ঘটে এই আখ্যানের, সেখানে ভিড় করে আসে অসংখ্য ঘটনা এবং যার সুবাদে অতীব বর্ণময় হয়ে ওঠে এই আখ্যান। পাঠক ক্রমে বুঝতে পারেন কী সহজে, কী আয়াসে একটি কাশ্মীরী পরিবার কলকাতার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যায়, কেমনভাবে উত্তরণ ঘটে। লেখকের শৈশব থেকে কৈশোর ও কৈশোর ও কৈশোর থেকে যৌবনে, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের কঠোর খ্রিস্টীয় অনুশাসন থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণের সুযোগে কেমনভাবে লেখক ছাত্র ফেডারেশনের সান্নিধ্যে একে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেন এবং কালক্রমে সদস্যপদ লাভ করেন পার্টির। এবারে শুরু হয় এক নতুন পর্ব। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করার সুবাদে তাঁর ওপর বর্তায় নানা ধরনের গোপন সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব। ফ্যাসিবাদের উত্থান, সোভিয়েত ইউনিয়নের উপরে হিটলারের আক্রমণ, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার শ্লোগান লেখককে আপ্লুত করে। ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টি আইনি ঘোষিত— জলি কাউলের হাতে - খড়ি হয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে, কলকাতা পোর্টে। ইতিমধ্যে আসে মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ স্বাধীনতার অবসান ঘটাতে গোটা পার্টিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অন্য অনেকের মতো লেখকও গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন এবং কারান্তরালে বইলেন দীর্ঘ তিন বছর (মার্চ ১৯৪৮ - এপ্রিস ১৯৫১)। পি. সি. যোশীর নেতৃত্বে জনযুদ্ধের শ্লোগানকে আশ্রয় করে ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সামিল না হওয়া, আবার ১৯৮৪ সালে যোশীকে হারিয়ে রণদিভে নেতৃত্বের ক্ষমতায় আসা এবং সম্পূর্ণ হঠকারী এক নীতি গ্রহণ করা, ১৯৫১ সালের পর থেকে অতি দ্রুত কমিউনিস্ট পার্টির সংসদীয় রাজনীতিতে শামিল হওয়া, অজয় ঘোষের মধ্যপন্থী অবস্থান সত্ত্বেও পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত বিভেদ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি, যা এক নতুন মাত্রা পরিগ্রহ করল ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিশংতিতম কংগ্রেস ও ১৯৬২ সালের চিন-ভারত যুদ্ধের পরে। লেখককে এই বিচিত্র ঘটনাবলি প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল, কী ধরনের অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, তার এক বিস্তৃত তথ্যসমৃদ্ধ, বিশ্লেষণাত্মক আখ্যান ধরা আছে বইটির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ অধ্যায় জুড়ে।

আবারও এক পর্বান্তর ঘটে যায় লেখকের জীবনে। ২১ জানুয়ারি, ১৯৬৩ সালে জলি কাউল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদে ইস্তাফা দেন এবং তার পরে পরেই শুরু হয় জীবন সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়। এককালের কমিউনিস্ট পার্টির হোলটাইমার, যিনি সাংগঠনিক দক্ষতা, বৌদ্ধিক উৎকর্ষ ও প্রবল জনপ্রিয়তার কারণে রাজ্যস্তরে ছিলেন কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক পি. সি. ও ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্য, ঘোর আর্থিক দৈন্যের মধ্যে যিনি ছিলেন স্থিতধী, এবারে প্রবেশ করলেন জীবনের সেই পর্বে, যখন তাঁর নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়াল বেকারত্ব, চরম অর্থকষ্ট ও রাজনৈতিক নিঃসঙ্গতা, যার বোধহয় একমাত্র শরিক ও অংশীদার ছিলেন তাঁর স্ত্রী, মহিলা আন্দোলনের অবিসংবাদী ও অবিস্মরণীয় নেত্রী মণিকুন্তলা সেন, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় পদে থাকার সুবাদে এবং চিন - ভারত যুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসেবে জলি কাউল তখন সব মহলেই ব্রাত্য। অতি কঠিন এই সময়ের এক বৃত্তান্ত, প্রায় তলিয়ে যেতে যেতে খড়কুটো আগলে কালস্রোতে ভেসে থাকার এই কাহিনি পাঠককে বাক্‌রুদ্ধ করে। ধীরে ধীরে সময় বদলায়, অন্ধকার কেটে আলো ফোটে— প্রথমে সাংবাদিকতা, তার পরে সম্পূর্ণ নিজের শিক্ষা ও দক্ষতার গুণে কর্পোরেট জগতে প্রবেশ লেখকের জীবনে এনে দেয় এক নতুন মাত্রা। একেবারে ভিন্ন স্বাদের এক অভিজ্ঞতা লক্ষ করেন লেখক; কিন্তু স্পষ্ট হয় এ কথাটাও যে কর্পোরেট জগতের সঙ্গে জীবিকার তাগিদে সংশ্রব ঘটলেও তাঁর বামপন্থী সত্তাটি অমলিন থেকে যায় এবং এই বিষয়ে আরও বেশি সতর্ক, আরও বেশি সংযমী মণিকুন্তলা। কর্পোরেট দুনিয়া থেকে অবসর নিয়ে লেখক আবারও ফিরে যান সাংবাদিকতায়, যখন তিনি 'ক্যাপিটাল' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে মণিকুন্তলার ক্রমবর্ধমান অসুস্থতা এবং অবশেষে মৃত্যু তাঁকে আরও একবার এক দুঃসহ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। হিমালয় তাঁকে অনেকদিন ধরেই টানে। উত্তরাঞ্চলের রামগড়ের পাহাড়ের প্রশান্তিতে তাই তিনি

আশ্রয় খোঁজেন এবং জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁর আকস্মিক যোগাযোগ হয়ে যায় গান্ধাবীদী কান্তি মেহতা-র সঙ্গে, যুক্ত হয়ে যান তাঁর সংগঠনের সঙ্গে, গভীরভাবে তৃপ্ত হন তাঁদের জনমুখী, মানবপ্রেমী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে অন্বিত করে।

লেখকের চলমান জীবনের ঘটনাবহুল এই বৃত্তান্ত একই সঙ্গে একদিকে যেমন তথ্যবহুল, অপরদিকে তেমনই উসকে দেয় একাধিক অতি গুরুত্বপূর্ণ। তত্ত্বভাবনাকে, যা অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সঙ্গে।

এক : যৌবনের প্রথম পর্বে, অক্টোবর বিপ্লবের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এক নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন নিয়ে লেখক যখন কমিউনিস্ট পাটিতে শামিল হলেন, জাগতিক সুখ সমৃদ্ধি পরিত্যাগ করে এক গভীর প্রত্যয় নিয়ে তিনি যখন বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করলেন, তার পর থেকে একটি প্রশ্ন তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে: পার্টি এবং বিপ্লবের নামে যে-কোনও কাজকে নীতিসিদ্ধ প্রতিপন্ন করার যে মানসিকতা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে কাজ করে, তার পরিণতিতে একটি প্রশ্ন থেকে যায়; মার্কসবাদে নৈতিকতার স্থান কোথায়? (পৃ: ৪৯)। নীতিভাবনা যদি সম্পূর্ণই আপেক্ষিক এবং পার্টি নির্ভর হয়, তার সর্বনাশা পরিণাম কী হতে পারে, সেটি পাঠকের পক্ষে সহজেই অনুমেয়।

দুই: লেখক কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে একেবারে তৃণমূল স্তরের কর্মী সবার সঙ্গেই দীর্ঘ কয়েক দশক জুড়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছেন এবং তারই সুবাদে তিনি যে সিদ্ধান্তে আসেন, তা অনেকের কাছেই প্রীতিপ্রদ হবে না। কয়েকজনকে বাদ দিলে পারি সর্বোচ্চ নেতৃত্বের এক বড় অংশের মধ্যে যে মানসিকতা কাজ করে (বিশেষত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পর থেকে অর্থাৎ, পঞ্চাশের দশকের শুরুতে) তা এককথায় এইরকম : পিতৃতান্ত্রিক, রক্ষণশীল, শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির তোয়াক্কা না করে কমিউনিস্ট পার্টিকে সর্বোচ্চ নেতৃত্বের এক বড় অংশের মধ্যে যে মানসিকতা কাজ করে (বিশেষত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পর থেকে অর্থাৎ, পঞ্চাশের দশকের শুরুতে) তা এককথায় এইরকম : পিতৃতান্ত্রিক, রক্ষণশীল, শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির তোয়াক্কা না করে কমিউনিস্ট পার্টিকে যিনিই অর্থ সাহায্য করবেন তাঁকে প্রাধান্য দেওয়া, বিলেত ফেরত কিংবা ইংরেজি ভালো বলতে কইতে পারেন এমন ব্যক্তিকে নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তরে আসীন হওয়ার প্রশ্নে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং পাতি-বুর্জোয়াসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি। অপরদিকে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁর মত এটাই যে কমিউনিস্ট পার্টির তিরিশ ও চল্লিশের দশকে যে গণভিত্তিটি তৈরি হয়েছিল, তার মূলে ছিল প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত, অনামী অসংখ্য শ্রমিক, যাঁদের অবিস্মরণীয় ত্যাগ ও সংগ্রাম পার্টির জমি তৈরি করে দিয়েছিল, কিন্তু যাঁরা সেই অর্থে কোনও স্বীকৃতি পাননি। নেতৃত্ব ও নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে এই ফারাক লেখককে পীড়া দিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে হতবাক করেছে। যে প্রশ্নটি তিনি একাধিকবার বামপন্থীদের সামনে তুলে ধরেছেন সেটি এই : কী রাজ্য, কী কেন্দ্র, অতীতে বা বর্তমানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের স্তরে শ্রমিকশ্রেণীর যথার্থ প্রতিনিধিত্বের প্রতিফলন আজও কেন ঘটল না?

তিন : ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা যদি হয় শ্রমিক-শ্রেণীর যথার্থ নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করতে না পারা, অপর প্রধান দুর্বলতা হল বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। লেখকের বিশ্লেষণে এরকম তিনটি ঐতিহাসিক ভুলকে চিহ্নিত করা যায়। প্রথমটি ঘটেছিল ১৯৪২ সালে, যখন 'জনযুদ্ধের' শ্লোগানকে আশ্রয় করে কমিউনিস্ট পার্টি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে শামিল হতে অস্বীকার করে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল এবং যার সুবাদে বিচ্ছেদ ঘটাল জনগণের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির। দ্বিতীয় ঘটনাটি ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত সি. পি. আই-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত সশস্ত্র সংগ্রামের আত্মঘাতী লাইন। জেলে থাকাকালীন লেখকের অভিজ্ঞতা থেকেই জানা যায় কতটা হাস্যকর ও অবাস্তব ছিল এই নীতি। তৃতীয় ঘটনাটি পঞ্চাশের দশকের গোড়ার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে আপাতদৃষ্টিতে কোনও ভুল না থাকলেও সমস্যা একটা রয়েই গেল। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত Tactical Line, যার মূল কথা ছিল সশস্ত্র গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল, বজায় রইল পঞ্চাশের দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত, যার ফলে কমিউনিস্ট পার্টির এক বড় অংশের মধ্যে এই বিশ্বাসটা রয়েই গেল যে সংসদীয় রাজনীতিকেই আশ্রয় করে কমিউনিস্ট পার্টিকে পুরোদস্তুর সংসদনির্ভর করে তুলতে প্রয়াসী হলেন। কার্যত মাদুরাই কংগ্রেসে (১৯৫৩) নেহরু সরকারকে সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক আখ্যা দিয়েও তাঁর কিছু কিছু অভ্যন্তরীণ নীতিকে প্রগতিশীলও বলা হল। অর্থাৎ, ১৯৫৩ সালেও দ্বিতীয় পার্টির কংগ্রেসের ভাবনা যে বেশ কার্যকরী ছিল, তা বোঝা যায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালের পালঘাট কংগ্রেসে এই দোদুল্যমানতার অবসান ঘটল।

চার : বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই জাতীয় মূল্যায়ন একদিকে যেমন কমিউনিস্ট পার্টিকে বিভিন্ন সময়ের জনসমক্ষে খাটো করেছে, দুর্বল করেছে তার গণভিত্তিকে, অপরদিকে এই বিভ্রান্তিকর মূল্যায়ন থেকে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে জন্ম নিয়েছিল তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, যার তিক্ত অভিজ্ঞতা লেখকের কাছে স্বস্তিদায়ক হয়নি। এই ঘটনার উৎকট প্রকাশ তিনি দেখেছিলেন ১৯৮৪ সালের পরবর্তী সময়ে, যখন পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত লাইনের জেরে রণদিভে গোষ্ঠী তাঁদের পছন্দের ব্যতিদের বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির কাজটি শুরু করলেন এবং যার ফলে যাঁরাই এই গোষ্ঠীর বিরাগভাজন, তাঁরা হয়ে গেলেন ব্রাত্য। সমস্ত নিয়মনীতি লংঘন করে পি. সি. যোশীকে যেভাবে তাঁর বিরোধী গোষ্ঠী এই পার্টি কংগ্রেসেই অবসারণ করলেন, লেখক তাতে বিস্মিত হয়েছিলেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন করার অবকাশ তাঁর ছিল না। রণদিভের এই ভূমিকার সমর্থন মেলে সম্প্রতি প্রকাশিত পি. সুন্দরায়া -র আত্মজীবনী (নতুন দিল্লি : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০০৯)-তেও। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব পরবর্তীকালে কলুষিত করেছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পার্টিকে এবং জাতীয় নেতৃত্বেও, যার ফলে পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত বিতর্ক (তথাকথিত 'দক্ষিণপন্থী' বনাম 'বামপন্থী') যখন ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করল, সেটিও জড়িয়ে গেল এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সঙ্গে। জলি কাউল -এর পার্টিতে ছিল না। ফলে উভয় গোষ্ঠীর কাছেই তিনি শেষ পর্যন্ত ব্রাত্য হয়ে গেলেন।

পাঁচ : পার্টির মধ্যে এই বাম - দক্ষিণ মতাদর্শগত বিভাজনে লেখক গোড়ার দিকে মূলত ছিলেন বাম-ঘেঁষা, অর্থাৎ, কংগ্রেসের সঙ্গে জাতীয় মোর্চা গঠনের পক্ষে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বিপক্ষে। পরবর্তীকালে চিন-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে 'বামপন্থী'দের চিনকে সমর্থনের লাইন তিনি মেনে নিতে পারেননি এবং ১৯৬৩ সালে পার্টির সদস্যপদ থেকে তিনি যখন ইস্তফা দেন, তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এটিই। কিন্তু আরও গভীর, আরও বড় যে প্রশ্ন তাঁকে ভাবাতে শুরু করে, তার সূত্রপাত

হয়েছিল ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি যে অন্ধ আনুগত্য, সোভিয়েত নেতৃত্বে যে অগাধ আস্থা কমিউনিস্ট পার্টকে বিশিষ্টায়িত করেছিল, যার শুরু হয়েছিল কমিনটার্ন ও পরবর্তীকালে কমিনফর্ম পর্বে, তা নিয়ে প্রথম সংশয়ের সূচনা করল ক্রুশ্চেভের স্তালিনজমানা সংক্রান্ত 'গোপন রিপোর্ট'। বহুদিন ধরেই যে প্রশ্ন লেখকের মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল, তা যেন বহিঃপ্রকাশ ঘটে গেল বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে। অক্টোবর বিপ্লবের যে আতর্শে উজ্জীবিত হয়ে লেখক বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন, তা যেন ভেঙে পড়ল ১৯৫৬ সালে এবং এরিক হব্সব্যম যেমন তাঁর আত্মকথন A Twentieth Century Life (London: Penguin, 2002) -এ বলেছিলেন যে এই ঘটনাই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের মহাপতনের আদি উৎস (পৃ. ১৮৯), কারণ বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসই প্রথমে উসকে দিল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বহুত্ববাদের ধারণাকে, প্রশ্ন দিল স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন অবস্থানের ভাবনাকে, অর্থাৎ যে স্তালিনবাদী একরৈখিক ভাষ্যকে আশ্রয় করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘ কয়েক দশক জুড়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে তার আধিপত্য বজায় রেখেছিল, তাতে এবারে ছেদ পড়ল। কিন্তু মজার কথা এটাই যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যে মতাদর্শগত বিরোধ এবারে তীব্র আকার ধারণ করল, যেখানে প্রকাশ পেল না কোনও স্বাধীন, বাস্তবমুখী চিন্তাভাবনা। হয় সোভিয়েতপন্থী নতুবা চিনপন্থী, এমনই এক মতাদর্শগত বিরোধে আচ্ছন্ন রইলেন এ দেশের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব।

ছয় : সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি থেকে লব্ধ মার্কসবাদের স্তালিনবাদী ভাষ্যই যে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে দুর্বল করেছে, ক্রমেই তাকে করে তুলেছে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এবং অপ্রাসঙ্গিক, লেখকের এই বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। একই সঙ্গে তাঁর আক্ষেপ যে বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেস শৃংখলা ও প্রশ্নাতীত আনুগত্যের শ্বাসরোধকারী পরিবেশে যে পরিবর্তনের হাওয়া এনেছিল, তার কোনও যথার্থ সদ্ব্যবহার পার্টি নেতৃত্ব করতে পারলেন না, যদিও লেখকের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে কিছুটা খোলামেলা আলাপ আলোচনার আবহ তৈরি হয়েছিল। পার্টির এই জড়তা, এই দ্বিধা, এই আশ্চর্য রক্ষণশীলতা, বিংশতিতম কংগ্রেস সম্পর্কে প্রায় নিশ্চুপ থাকা, অর্থাৎ, স্তালিনবাদের প্রশ্নে এই প্রবল অস্বস্তিকর ব্যাখ্যাই বা কি? এর মূল রয়ে গেছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার তত্ত্বে, যা প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্রের কোনও পরিবেশ বা আবহকে আমল না দিলেও সি. পি. আইন ও সি. পি. আই (এম) উভয় নেতৃত্বই মনে করেন যে এর মধ্যেই গণতন্ত্রকে যথার্থ ও যথেষ্ট স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, (পৃ. ২২৭)। স্তালিনবাদের বিষ এভাবেই পার্টি নেতৃত্বকে গ্রাস করেছে একেবারে গোড়া থেকে, যার ফলে মুখে স্পষ্ট কিছু না বললেও কার্যত স্তালিনবাদকেই আঁকড়ে ধরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যখন আবার সংসদীয় রাজনীতি এবং তার সূত্র ধরে নির্বাচিত রাজনীতিকেই ধ্যানজ্ঞান করতে শুরু করলেন, তখন তা জন্ম দিল এক অভূতপূর্ব সংকটের, যে সংকট শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল এক মৌলবাদী, প্রায় ধর্মীয় বিশ্বাসের সংকটের মতো (পৃ. ৯২)।

তাই লেখক যখন তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার নিরিখে কমিউনিস্ট পার্টির সমলোচনা করেন, সেই সমালোচনা কোনও বাম বা মার্কসবাদবিরোধী অবস্থান থেকে নয়। তাঁর এই আত্মকথন অনেকটাই বাতলে দেয় বামপন্থা, কমিউনিস্ট পার্টি কেমন করে এই সংকট অতিক্রম করতে পারে। অনেক নেতিবাচক দিক সত্ত্বেও লেখক আস্থা রেখেছেন শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি, সাধারণ তৃণমূলস্তরের পার্টিকর্মীদের পূর্ণ সময়ের সদস্যদের প্রতি, যাঁরা লেখকেরই মতো এক উন্নততর দুনিয়া গঠনের স্বপ্ন আজও দেখেন। লেখক বারেবারেই স্মরণ করেছেন নিখিল চক্রবর্তী ভূপেশ গুপ্ত, প্রশান্ত সান্যাল, অজিত রায় প্রমুখকে, যাঁরা কিন্তু পার্টির সদস্যপদে ইস্তফা দেওয়ার পরেও তাঁকে পরিত্যাগ করেন নি, তাঁর ঘোর দুর্দিনেও তাঁকে অবাঞ্ছিত বা অপাংক্তেয় গণ্য করেননি। বিপদের দিনে, গভীর সংকটের সময়ে পাশে দাঁড়ানোর এই মানসিকতা এক সময়ে কমিউনিস্ট পার্টিকেও প্রবল শক্তি জুগিয়েছিল। হয়তো তারই ফসল ছিলেন উল্লিখিত এই মানুষজন। আার এই মানবতাবাদকেই যখন অন্ধ আনুগত্য ও শৃংখলার নামে পদদলিত করা হয়েছে, লেখক ব্যথিত হয়েছেন, তাঁর আশাভঙ্গ হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির হাত ধরে মানবতার মুখ খুঁজতে তিনি যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ করতেই বোধ হয় তিনি এবং জীবনের শেষ পর্ব মণিকুন্তলা বিবেকানন্দে আশ্রয় খোঁজেন, আশ্রয় খোঁজেন রামগড়ের পর্বতেও অরণ্যে এবং কান্তি মেহতার সাহচর্যে এসে গান্ধীদর্শনে।